শ্রাদ্ধ ও পরলোক

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
প্রণীত

আর্য্যসমাজ
১৯ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ওম্

শ্রাদ্ধ ও পরলোক

কর্মবাদকে অস্বীকার করায় জগতে নানা অশান্তি-উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে। পাপী যতই পাপ করুক না কেন, তাহার কোনই চিন্তার কারণ নাই। আত্মীয়েরা মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলেই তাহার মুক্তি। এই সর্বনাশকর প্রথার ফলে পুণ্যবানও পাপের ভয় করে না। দৈনিক, মাসিক, ষান্মাষিক ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া প্রেতের সদ্‌গতি করা হয়। গয়া, প্রয়াগ, মথুরা কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়াও পূর্ব পুরুষকে উদ্ধার করা হইল, কিন্তু তবুও উদ্ধারের কোনই লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তিথি অনুসারে একই ব্যক্তির শ্রাদ্ধ প্রতি বৎসরেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে ও প্রতি বৎসরেই প্রেতকে উদ্ধার করা হয়। তীর্থে যত বার যত জন যায় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ও প্রেতোদ্ধারের সৎকার্যটি ততবার ততজনেই করে। মুসলমান খৃষ্টান বা ইহুদীর মুক্তি মাত্র এক মহম্মদ, যীশু ও মুসার দ্বারাই সম্ভব হয়, কিন্তু পৌরাণিকের স্বর্গ দিনে-দিনে, মাসে-মাসে বৎসরে-বৎসরে কত শত পুরোহিতের দয়ায়, কত শত তীর্থে, কত শত পিণ্ডদানে, শ্রাদ্ধ-কার্যে ও পদধূলিতে তবে সম্ভবপর হয় (একই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে কতবার যে উদ্ধার করিয়া পুনরায় আনিয়া পিণ্ড খাওয়ান হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

শ্রাদ্ধের এত মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল কেন? গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগাদি তীর্থক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পিতরগণ অক্ষয়-স্বর্গলাভ করিবে শ্রাদ্ধে দান করিলে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইবে—
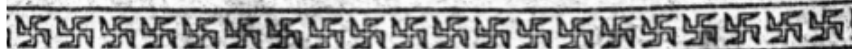
এই সব হিতবাণী প্রচারিত হইল কেন? উত্তর অতীব সরল। জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক ইহকালের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা তাহারা সমাজ সেবা করে। নাপিত ক্ষৌর কার্য দ্বারা, বেহারা পাল্কী বহন করিয়া, নাবিক নৌকা বাহিয়া রজক কাপড় ধুইয়া, মেথর পায়খানা পরিষ্কার করিয়া জীবিকা অর্জন করে। ইহাতে মূলধন বা শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ পুরোহিত পরকালের ব্যবসায় লইয়া ব্যস্ত। ইহারা যে কোনও প্রকারে প্রেতাত্মা গণকে উদ্ধার করিবেই করিবে। ইহাদের ব্যবসায়ে মূলধনের প্রয়োজন নাই, পিণ্ড দানের মন্ত্র দুই একটি কণ্ঠস্থ করিলেই চলিবে। এ ব্যবসায়ে সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, তাই পরকালের অন্ধকারের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহারাই লইয়াছেন। আত্মীয়ের নিকট হইতে মশারি, ছাতা, পালঙ্ক, থালা, বাটী, গাভী, পাদুকা ও খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া তাঁহারা প্রেতলোকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ পর্যন্ত কোনও পার্শেলেরই ফেরৎ রসিদ আসিল না। পার্শেল যমারাজের বাড়ীতে বা প্রেতলোকে না গিয়া প্রতি শ্রাদ্ধেই তাহা পুরোহিতের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই ঋষি বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন—"মৃত পুরুষের শ্রাদ্ধ করিলেই যদি তাহা তৃপ্তিদায়ক হয় তবে বিদেশ যাত্রীর জন্য পাথেয় কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন।"[১] গৃহ হইতে শ্রাদ্ধ করিলেই বিদেশগামীর নিকট সেই সব জিনিসপত্র গিয়া পৌঁছিত। ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য ঘোষিত হইল—"শ্রাদ্ধের প্রথম দিন যে সব ব্রাহ্মণকে

১। মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারণম্। গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্॥

নিমন্ত্রণ করা হয় পিতরগণ তাঁহাদের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া ভোজন করিয়া তবে স্বস্থানে গমন করেন।[১]" অন্য দিকে পদ্ম পুরাণ বলিতেছে—"যাহারা তামাকখোর ব্রাহ্মণকে দান দক্ষিণা দেয় তাহারা নরকে যায় এবং সেই ব্রাহ্মণ গ্রাম্য শূকর হইয়া জন্মে।[২]" ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া বা ভোজ্য বস্তু দান করাইয়া দক্ষিণা দিতে হয় কিন্তু পূজা, অর্চনা, ব্রত, পার্বণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে যে সব তামাক খোর ব্রাহ্মণ কড়ি-বাঁধা হুকায় তামাক খাইতে উপস্থিত হয় বা বিড়ি সিগারেট পান করে তাহাদিগকে দান দিয়া গৃহস্বামী নরক ভোগ করিতেছে এবং সেই সব ব্রাহ্মণ পদ্ম-পুরাণের মতে গ্রাম্য শুকর হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রাদ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার অন্যান্য কারণও আছে। সমাজের মধ্যে অনেক দুষ্প্রবৃত্তির মনুষ্য বাস করে, তাহারা বিধবা বিবাহ দেখিয়া ভয় করে, তাহারা বিধবা হাত ছাড়া করিয়া বিবাহ দিতে চায় না, তাহালে তাহাদের ক্ষতি আছে। তাহারা সব সময়েই পতিলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। পতিলোকে পতি পিণ্ড খাইবার জন্য কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, মরিবার পরেই বা কিরূপে পতির পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে—এই সব কাহিনী সমাজের মধ্যে প্রচার করে। শ্রাদ্ধ রাখিতে হইলে বিধবাকে বিধবা করিয়াই রাখিতে হইবে তবেই ত সে পতি লোকে পতি কল্পনা করিয়া বৈধব্য পালন করিবে।

১। নিমন্ত্রিতাস্তু যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্ব দিনে খগ। প্রবিশ্য পিতরস্তেষু ভুক্তা যান্তি স্বমালযম্॥ (প্রেঃ খঃ ২০।২৬)

২। ধূম্রপানরতং বিপ্রং দানং কুর্বন্তি যে নরাঃ। দাতারঃ নরকং যান্তি ব্রাহ্মণো গ্রাম্য শূকরঃ॥

শ্রাদ্ধে দেশ ও সমাজ নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ অন্নবস্ত্র সমস্যা, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দিনে কতকগুলি অলস, নিমন্ত্রণ-জিবী শঠ ও ধূর্তকে ভোজন করাইতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াও অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এক একটি গৃহ শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধেই নিঃশেষ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—সেই সব অলস, নিমন্ত্রণ প্রিয় পেটুক জগতের কোনও কার্যে না গিয়া সমাজের মধ্যে মৃত্যু ও শ্রাদ্ধের তালিকা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তৃতীয়তঃ—মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন পরিবারে শোকের আগুন নিভিতে না নিভিতেই অনেক সময় নিষ্ঠুর পুরোহিত অশক্ত, অক্ষম দীন, দরিদ্র পরিবারকে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের ব্যয় ও দক্ষিণা নির্মম কসাইয়ের মত আদায় করে এবং নিজেকে রাক্ষসী বৃত্তিতে ভরপুর করিয়া তুলে। চতুর্থতঃ—স্বার্থপর সমাজপতি ও কুচক্রী স্বজন, শ্রাদ্ধের অবসরে অনেক গৃহস্বামীকে ছলে-বলে-কৌশলে বিপন্ন করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। পঞ্চমতঃ—শ্রাদ্ধের সময় নানারূপ বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে এই আশঙ্কায় অনেকে বিবেক বিরুদ্ধ কার্য করিয়া থাকেন। ষষ্ঠতঃ—শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, জাতিভেদ, কৌলিন্য অস্পৃশ্যতার ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভোজন ও পুরোহিতের অনুগ্রহ না হইলে মৃত মাতাপিতাকে প্রেতলোকেই বাস করিতে হইবে, গঞ্জিকাসেবী মদ্যপায়ী ব্যাভিচারী পুরোহিতও সাধু সচ্চরিত্র পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহাকে স্বর্গে পাঠায়। স্বর্গের চাবি কাঠিই শ্রাদ্ধ এবং সেই শ্রাদ্ধই ব্রাহ্মণের হাতে। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানই পুরুষ পরম্পরায় আভিজাত্যের সিংহাসনকে সুদৃঢ় রাখিয়াছে। সপ্তমতঃ—শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানকে অবলম্বন করিয়া নানারূপ ভুত-প্রেতের কল্পিত কাহিনী দেশে প্রচারিত হইয়া অসংখ্য কুসংস্কারের

রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে। অষ্টমতঃ—পুরোহিত বংশের সর্বনাশ হইল। যজমানের মৃত মাতাকে প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করিতে করিতে পুরোহিতগণ নিজেরাই উদ্ধাই পাইতে বসিয়াছে। অসত্য ও প্রতারণার জীবিকা যিনিই গ্রহণ করিবেন ধরা পৃষ্ঠ হইতে তিনিই মুছিয়া যাইবেন। পুরোহিতের ছেলেরা প্রায়ই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। কোনও প্রকারে প্রেতোদ্ধারের মন্ত্র ছেলেকে শিখাইতে পারিলেই কয়েক ঘর যজমানে সংসার চলিয়া যাইবে—ইহাই সাধারণতঃ পুরোহিতের মনোভাব। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, মানুষ কোথা হইতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুর পরপারে কি,—স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র এসব বিষয়ে কি বলে—এসব ভুলিয়া গিয়াই হিন্দু এই সব শ্রাদ্ধ কল্পনা করিয়াছে।

পরলোক

পরলোক সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত এইরূপ। বর্তমানের অস্তিত্বেই অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অদ্য আছে বলিয়াই কল্য এবং ইহলোক আছে বলিয়াই পরলোক। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার নাস্তিত্ব আসিতে পারে না এবং যাহার নাস্তিত্ব আছে তাহার অস্তিত্ব আসিতে পারে না—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" জীবন সত্য বলিয়াই মৃত্যু সত্য এবং মৃত্যু সত্য বলিয়াই পরলোকও সত্য। জন্ম, মৃত্যু ও পরজন্ম একই সত্যের তিনটি পরিভাষা। আত্মার শরীর গ্রহণের নাম জন্ম এবং শরীর ত্যাগের নাম মৃত্যু। অস্থি মাংসের জড় পিণ্ড এই শরীর নষ্ট হইলেই আত্মার নাশ হইতে পারে না—ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই শরীর পরিবর্তন বা মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় ইহাই প্রশ্নঃ কর্মই মানুষকে মৃত্যুর পর উপযুক্ত পথে লইয়া যায়। কর্মের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ—যাহাদের কর্ম পাপ ও পুণ্য মিশ্রিত ; দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা পাপ কার্য না করিয়া পুণ্য কার্য করেন কিন্তু সে পুণ্য কর্ম সকাম ; তৃতীয়তঃ যাঁহারা পাপ না করিয়া পুণ্য কার্য করেন এবং সে পুণ্য কর্ম নিষ্কাম। এই তিন প্রকারের কর্ম অনুসারে মানুষ তিন প্রকারের গতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় গতিকে পিতৃযান ও তৃতীয় গতিকে দেবযান বলে। এ পথ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ন্যায় কোন ভৌতিক পথ নহে। জীবের পারমার্থিক উন্নতির স্তর প্রকাশ করিবার জন্যই পিতৃযান ও দেবযান শব্দ ব্যবহৃত

হয়। মানুষের শরীরও তিন প্রকারের—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিন শরীরেরই পৃথক্ পৃথক্ কার্য। এক শরীর দ্বারা অন্য শরীরের কার্য চলে না। স্থূল শরীর—হস্ত, পাদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি অবয়বের সমষ্টি মাত্র। এই স্থূল শরীর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত। পঞ্চভূত কারণ এবং শরীর কার্য। সূক্ষ্ম শরীর বুদ্ধি, অহঙ্কার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা গঠিত। সূক্ষ্ম শরীর শক্তি রূপে অবস্থান করে, সূক্ষ্ম শরীরের পুষ্টিতেই মানসিক উন্নতি। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যবস্থার নাম কারণ প্রকৃতি, ইহা দ্বারাই কারণ শরীর নির্মিত। এই শরীরের পুষ্টি হইলেই মনুষ্য যোগী এবং ঈশ্বরের ভক্ত হয়। স্থূল শরীরে অন্নময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ এবং কারণ শরীরে আনন্দময় কোষ। স্থূল শরীরের মৃত্যুকেই লোকে মৃত্যু বলে। সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর আত্মা হইতে বিচ্যুত হইলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা মুক্তি।

প্রথম গতি—পাপ পুণ্য দুই প্রকারের মিশ্রিত কর্ম সঞ্চয় করিলেই মনুষ্য এই গতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কর্ম করিতে স্বতন্ত্র এবং এই স্বতন্ত্রতায় তাহার জন্ম সিদ্ধ অধিকার। দুষ্ট কর্ম করিয়া স্বতন্ত্র মনুষ্য পরতন্ত্রতায় কারাগারে আবদ্ধ হয়। মনুষ্য যোনিতে জীব ভোগ করে এবং স্বতন্ত্রতার সহিত কর্মও করিতে পারে। মনুষ্য যোনি ব্যতীত পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম লতা ইত্যাদি সমস্ত যোনি কারাগারের ন্যায় ভোগ যোনি। মনুষ্য ইন্দ্রিয়কে পাপকর্মে অভ্যস্ত করিয়া স্বয়ং তাহাতে আবদ্ধ হয়। করুণাময় ও ন্যায়াধীশ পরমাত্মা কৃপা করিয়া মানুষকে সেই পাপ-

পরায়ণ ইন্দ্রিয় হইতে বাঁচাইবার জন্য সেই ইন্দ্রিয়রহিত কোন যোনিতে তাহাকে নিক্ষেপ করেন। অধিকার গ্রহণ করিয়া তাহার অপব্যবহার করিলে সে অধিকার ছিন্ন হইবেই। পরমাত্মা আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা স্বাধীন ভাবে কর্ম করিবার অধিকারও দিয়াছেন। যদি কেহ কোন ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করে তবে সেই ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যাইবেই। সেই ইন্দ্রিয়কে বাঁচাইতে হইলে, সেই ইন্দ্রিয়কে কর্ম হইতে বিশ্রাম দিতে হইবে। যদি কোনও মনুষ্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পাপ কর্মে অভ্যস্ত করিয়া থাকে, তবে তাহাকে চক্ষুহীন কোনও যোনিতে যাইতে হইবে। করিতে করিতে করার অভ্যাস এবং না করিতে করিতে না করার অভ্যাস জন্মে। চক্ষু না থাকায় চক্ষুর কার্য বন্ধ থাকে এবং কার্য বন্ধ থাকিলেই চক্ষুর পাপ-অভ্যাস বন্ধ হইয়া যাইবে। অভ্যাস বন্ধ হইয়া গেলেই জীব পুনরায় মনুষ্য যোনিতে প্রবেশ করিবে।

মনুষ্য ব্যতীত পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি প্রাণীর মধ্যে কাহারও একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব, কাহারও দুই ইন্দ্রিয়ের অভাব। এই ভাবে অনেকের সকল ইন্দ্রিয়েরই অভাব। সর্পের চক্ষু আছে, কর্ণ নাই। চক্ষু দ্বারা সে দেখে ও শুনে বলিয়াই তাহার নাম চক্ষুশ্রবা। যখন সে দেখে, তখন সে শুনিতে পায় না এবং যখন সে শুনে, তখন সে দেখিতে পায় না। সাপুড়িয়ারা এই জন্যই সর্পের নিকটে বাঁশী বাজায়। যখন সে শুনে, তখন কিন্তু সে দেখে না এবং যখন চক্ষুর উপর ধুলি নিক্ষেপ করে তখন সে দেখিতেও পায় না শুনিতেও পায় না। বৃক্ষের কোনও ইন্দ্রিয় নাই। মানুষ যতগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অসৎ কর্ম করিবে ততগুলি ইন্দ্রিয় রহিত কোন যোনিতে তাহাকে যাইতে হইবে। সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা

পাপ করিলে তাহাকে সর্ব ইন্দ্রিয়হীণ যোনিতে প্রবেশ করিতে হইবে। মানুষ পাপ-পরায়ণ ইন্দ্রিয়কে শোধন করিবার জন্য যতবার অন্য যোনিতে যাইবে ততবারই তাহাকে মনুষ্য যোনিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এক মনুষ্যেতর যোনি হইতে সে অন্য মনুষ্যেতর যোনিতে যায় না। "জ্ঞান ও কর্ম অনুসারে কোনও প্রাণী চলচ্ছক্তি সম্পন্ন জঙ্গম যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কোনও প্রাণী চলচ্ছক্তি হীন স্থাবর যোনিতে প্রবেশ করে।"[১]

মনুষ্যেতর অন্যান্য যোনিতে এইরূপ জন্মগ্রহণের নামই পুরাণের ভাষায় নরক। জীবের কল্যাণের জন্যই ন্যায়াধীশ পরমাত্মার এইরূপ বিধান। দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য শোধন। শ্রাদ্ধ, পিণ্ড বা তর্পণ করিলে এ ন্যায় দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা দণ্ড নয়—করুণা। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা যেমন বৃথা, মৃত্যুর পূর্বে জীবিত ব্যক্তিদের মমতার বশে ব্যাকুল হওয়া তেমনই বৃথা। আত্মাকে লিঙ্গভেদ, জাতিভেদ বা সম্বন্ধভেদ—কিছুই নাই। মানুষের আত্মাই পশু যোনিতে প্রবেশ করিয়া পশু, পক্ষী যোনিতে পক্ষী, বৃক্ষ যোনিতে বৃক্ষ, স্ত্রী শরীরের স্ত্রী এবং পুং শরীরে পুরুষ রূপে পরিচিতা পুত্রের শরীরের সহিত যতক্ষণ আত্মা যুক্ত থাকে ততক্ষণই পুত্র এবং কন্যার দেহে যুক্ত থাকিলেই কন্যা—মৃত্যুর পর সেই আত্মার হয়ত বিড়াল যোনিতে প্রবেশ করিয়া বিড়াল রূপে পরিচিত হইবে। শরীরই সম্বন্ধের কারণ, কারণ নষ্ট হইলেই সম্বন্ধরূপী কার্যও নষ্ট হইয়া যায়।

১। "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথা-কর্ম যথাশ্রুতম্"।। (কঠোপনিষৎ ৫।৭)।

আজ যে পিতা, পুত্রের জন্য এবং স্বামী-স্ত্রীর মমতার বশে মোহের জালে আবদ্ধ হইয়া ছটফট্ করিতেছে, কাল সেই পিতা বা স্বামীর আত্মা হয়ত বৃক্ষ যোনিতে প্রবেশ করিবে। তখন সম্বন্ধের সহিত মায়া মমতারও অবসান ঘটিবে। মানুষ-যোনিতে প্রবেশ করিলেও মমতা বা মোহের বন্ধন থাকিবে না। সম্বন্ধ থাকিলে ত মমতা বা মায়া। মাথাই নাই, মাথার ব্যথা কিসের? যে মানুষ দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবে সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবশিষ্ট প্রিয় আত্মীয় স্বজন ও ভোগ্য পদার্থের মমতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

প্রাণ ত্যাগের সময় যখন জীবাত্মা উর্দ্ধশ্বাস লইতে আরম্ভ করে তখন প্রাণ ইন্দ্রিগণকে সঙ্গে করিয়া বিদায় অভিনন্দনের জন্য চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক সময় যে চেতনা বা সজীবতা দেহের সর্বাংশে বিস্তৃত ছিল একে একে তাহাকে উঠাইয়া জীবাত্মা হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হয়। কর্ণ হইতে তেজ উঠাইয়া লইলেই তখন আর সে জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধবের বিলাপ ধ্বনি শুনিতে পায় না। চক্ষু হইতে তেজ উঠাইয়া লইলে তখন আর সে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতার প্রিয়মুখ দেখিতে পায় না। মুখ হইতে তেজ উঠাইয়া লইলে তখন আর সে একটি কথাও বলিয়া যাইতে পারে না বা এক বিন্দু জলও পান করিতে পারে না, ত্বক্ হইতে তেজ উঠাইয়া লইলে তখন সে কিছুরই স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না। এই ভাবে যাবতীয় বাহ্য ইন্দ্রিয় গোলক যেমন অকর্মণ্য হইয়া যায় তেমনি অন্তরিন্দ্রিয় মন হইতেও তেজ গ্রহণ করাতে তেমনই তাহা অকর্মণ্য হইয়া যায়। তখন আর সে কিছুই জানিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না। নেত্র, কর্ণ, মুখ বা শরীরের অন্য যে কোনও দ্বার দিয়া এইরূপে

জীবাত্মা শরীর হইতে বহির্গত হয়। প্রাণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ তখন জীবাত্মার সঙ্গে স্থূল শরীর পরিত্যাগ করে। জীবাত্মার সঙ্গে তখন তাহার জ্ঞান, কর্ম ও পূর্ব জন্মানুভূত বুদ্ধি বা পূর্ব-প্রজ্ঞাও থাকে। এইরূপে যখন জীবাত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ লইয়া যোনিতে গমন করে, তখনই তাহাকে মৃত্যু বলে। এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে প্রবেশ করিতে এত অল্প সময় লাগে যে সেকেণ্ড, পল মুহূর্ত বা অনুপলাদি সময়েরও কোন কাল্পনিক মাপকাঠি দ্বারাও তাহা মাপা যায় না।

"জলৌকা (জোঁক) যেমন একটি তৃণ ধরিয়া তবে অন্য তৃণকে ছাড়িয়া দেয় জীবাত্মাও তেমনই এক শরীরকে আশ্রয় করিয়া তবে অন্য শরীর ত্যাগ করে[১]"—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে।

দ্বিতীয় গতি— যে সব মনুষ্য শুধু পুণ্য কার্যই করে পাপের লেশ মাত্রও যাহাদের কার্যে স্থান পায় না তাহাদের সেই পুণ্য কর্ম সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা সকাম পুণ্য কর্ম করেন তাঁহারই এই দ্বিতীয় গতি লাভ করেন। ফলের ইচ্ছা করিয়া কোনও কর্ম করিলে তাহা সকাম কর্ম এবং ফলের ইচ্ছা না করিয়া শুধু ধর্ম বা কর্তব্য বোধে যে কর্ম করা যায় তাহা নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মই গীতার কর্মযোগ। কর্ম করিতেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নয়। তুমি

১। তদ্যথা তৃণ জলৌযুকা তৃণস্যান্তং গত্বাহ ন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমূপ সংহরত্যে বমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যা বিদ্যাং গমযিত্বাহ ন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমূপ সংহরতি। (বৃহদারণ্যাক ৪।৪।৩)।

কর্মফলের হেতু হইও না, অকর্মেও আবদ্ধ হইও না।[১]" কর্মাকর্ম, ধর্মাধর্মের বিচার ত্যাগের নাম নিষ্কাম ভাব নহে। যে কার্যে বাসনা উৎপন্ন করে না, তাহা নিষ্কাম কর্ম এবং যে কার্যে বাসনা উৎপন্ন করে তাহা সকাম কর্ম বাসনা সংস্কার মাত্র। ইহা স্মৃতিরূপে চিত্রে জমা হয়। সদসৎ কোন কার্য করিলে পুনরায় তাহা করিতে ইচ্ছা করে—ইহাই বাসনা। হৃদয় গ্রন্থি যত সময় থাকিবে জন্ম মরণের বন্ধন হইতে তত সময় মুক্তি নাই। যখন হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায় অর্থাৎ সকাম কর্মের ফল স্বরূপ বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, সংশয়, দূর হইয়া যায় এবং সকল প্রকারের সকাম কর্ম ক্ষীণ হইয়া যায় তখনই মনুষ্য মোক্ষের অধিকারী হয়।[২]" যাঁরা পুণ্য কার্য করেন, মৃত্যু-কালে তাঁহাদের মন যেখানে যে কামনায় আসক্ত হয়, সেই কামনার পূর্তি যে লোক এবং যে যোনিতে হইতে পারে জীবাত্মা সেই স্থানেই যায়[৩]। বাসনা পূরণের জন্য জীব লোকান্তরের যে কোনও স্থানে যে কোনও যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহারা কেবলই সুখ ভোগ করেন—দুঃখের লেশমাত্রও তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না। এই অবস্থার নাম চান্দ্রমসী। মরণের পর জীবকে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সময়ে ধূম্র রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ যান্মাসিকী, বায়বীয়, ও আকাশীয় এই ছয়টি অবস্থা অতিক্রম করিয়া তবে সপ্তম অবস্থা চান্দ্রমসীতে আসিতে হয়। জ্যোতি বা প্রকাশের ক্রমোন্নতি ব্যক্ত

১। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সংগোহস্তকর্মণি॥(গীতা ২। ৪৩)।

২। ভিদ্যতে হৃদযগ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশযাঃ। ক্ষীযন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২। ২। ৮)

৩। "তুদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪। ৪। ৬।

করিবার জন্য এই সব রূপক নাম রাখা হইয়াছে। চিত্ত যখন বাসনা হইতে মুক্ত হয় তখনই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন খুলিয়া যায়। কিন্তু সকামকর্ম ত্যাগ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম না করিলে চিত্ত কখনও বাসনা শূন্য হয় না। সকাম হউক নিষ্কাম হউক কর্মের ফল অবশ্যই মিলিবে, তবে নিষ্কাম কর্মের ফল সকাম কর্মের ফল অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ। আশা করিয়াছিলাম, তাই একটি জিনিষ পাইলাম ইহা অবশ্যই সুখপ্রদ কিন্তু আশা না করিয়াই একটি জিনিষ পাইলাম ইহা অধিকতর সুখপ্রদ সন্দেহ নাই। চান্দ্রমসী দশায় সকাম পুণ্য কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে জীবকে পুনরায় ক্রমান্বয়ে চান্দ্রমসী দশা হইতে আকাশীয়, বায়বীয়, ধূম্র ও অভ্র এই কয়েকটি অবস্থা অতি স্বল্প কালে অতিক্রম করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই অবস্থাগুলির নামও রূপক। অভ্র দশা হইতে জীবাত্মা মেঘ বৃষ্টি দ্বারা অন্নের ভিতর দিয়া মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করে এবং শুক্রের আকারে মাতার রজের সঙ্গে মিলিয়া মাতার শরীরে গর্ভরূপ ধারণ করিয়া তবে মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়। চন্দ্রামসী দশা হইতে জীব সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে করিয়া স্থূল শরীর গ্রহণ করে। 'শরীরের আদি উপাদান 'কালল রস' (protoplasm) মনুষ্য শরীরে নাই, বৃক্ষাদিতে ইহা জন্মে। এই জন্যই মনুষ্য-শরীরে আসিবার জন্য জীবকে প্রথমেই বনস্পতি বা অন্নাদির শরণ গ্রহণ করিতে হয়।"[১] অন্নাদি আশ্রয়ের জন্য তাহাকে বৃক্ষ যোনিতে জন্ম লইতে হয় না—কেবলমাত্র সংযোগেই হয়। জীব ওষধি দ্বারা বীর্যরূপ হইয়া স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করে[২]।

১। শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামী কৃত "মৃত্যু ও পরলোক"

২। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১০।৬।

তৃতীয় গতি—যিনি নিষ্কাম পুণ্য কর্ম করেন শ্রদ্ধাময় ও তপস্বী জীবন যাপন করেন তাঁহার নাম জীবন্মুক্ত পুরুষ ; জীবন্মুক্ত পুরুষই এই তৃতীয় গতি প্রাপ্ত হন। জীবাত্মা মৃত্যুর পর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে আর্চিষী, আন্তিকী, পাক্ষিকী, উত্তরায়ণী, সম্বৎসারী, সৌরী চান্দ্রমসী ও বৈদ্যুতি এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই নামগুলির দ্বারা ব্রহ্মলোক জ্যোতির ক্রমোন্নতি রূপক ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মলোক স্থান বিশেষ নয় অবস্থা বিশেষ মাত্র। মুক্ত জীব যত্র তত্র বিচরণ করিতে পারে। এই অবস্থায় জীব পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অর্থ আনন্দ প্রাপ্তি। প্রকৃতি সৎ স্বরূপ, জীব সৎ ও চিৎ স্বরূপ এবং ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, জীব ব্রহ্মের সমীপতার আসিলে আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতির সমীপতায় আসিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মুক্ত জীবের সহিত কোনও প্রকারের শরীরই থাকে না, নিষ্কাম কর্ম অর্জিত বিজ্ঞান থাকে। এই কর্ম ও বিজ্ঞানের যোগেই "ধর্ম"[২]। জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গতিতেই মুক্তি সম্ভব হয়। অসীম কর্ম ও জ্ঞান দ্বারা অসীম আনন্দ লাভ করা যায় না তাই মুক্তিও সীমাবদ্ধ। কর্ম ও জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে মুক্তজীব পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। মুক্তি ভোগের কালও পরিমাণ ভেদে পাঁচ প্রকারের। মুক্তি ভোগের পর পুনরায় মুক্ত জীবকে প্রতি প্রলয়ের পর নব সৃষ্টির প্রারম্ভে অমৈথুনী সৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

পরলোক সম্বন্ধে ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। কতকগুলি বৈদিক শব্দ পৌরাণিক যুগে বিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার ফলেই সমাজের সাধারণ মনুষ্য নানা ভাবে প্রতারিত হইতেছে। যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ দান, পূজা ও সংগতি কিন্তু এই পরবর্তী যুগে তান্ত্রিকেরা পশুবলি

অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। যজ্ঞের অর্থ ছিল শুভকর্ম, বিকৃত হইয়া হইল,—হত্যা। পশুযজ্ঞের অর্থ পশুর হিতসাধন করা, পরে হইল পশুকে হত্যা করিয়া গন্ধর্ব লোকে পাঠইয়া হিতসাধন করা। পিতৃ যজ্ঞের অর্থ জীবিত মাতা-পিতার সৎকার অর্থাৎ সেবা যত্ন—পরে হইল মৃত পিতাকে পিণ্ডদান। শ্রাদ্ধ শব্দেও এইরূপ বিকৃতি আসিয়াছে। "শ্রৎ সত্যং দধাতি যযা ক্রিযযা সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধযা যৎ ক্রিযতে তচ্ছ্রাদ্ধম্ ।।" যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা যায় তাহার নাম শ্রদ্ধা এবং যাহা শ্রদ্ধা সহকারে করা যায় তাহার নাম শ্রাদ্ধ। "তৃপ্যন্তি তর্পযন্তি যেন পিতৃন্ তত্তর্পনম্।" যে ক্রিয়া দ্বারা তৃপ্তি সাধন হয় তাহার নামই তর্পণ। এই তৃপ্তি ক্রিয়া জীবিত মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজনের জীবিত কালেই সম্ভব, মৃত্যুর পর জল নিক্ষেপ করিয়া এই তৃপ্তি সাধন করা অসম্ভব।

"মৃত্যুর ১২ দিন পর উৎপন্ন হওয়া—এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বেদের একটি মন্ত্র[১] ঠিক বুঝিতে না পারায় কখনও কখনও এই ভ্রম উৎপন্ন হয়। মন্ত্রটীর যথার্থ তাৎপর্য এইরূপ—

বেদ, তৃতীয় গতি প্রাপ্ত প্রাণীদের মার্গের (দেবযান) ক্রম বর্ণনা করিতেছে। ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ্ এবং বেদমন্ত্র বর্ণিত "দেবযানে"র ক্রম প্রায়ই একরূপ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইহাতে কোনও মৌলিক ভেদ নাই[২]।"

১। সবিতা প্রথমেঽহন্নগ্নির্দ্বিতীযে বাযুস্তৃতীয আদিত্যশ্চতুর্থে চন্দ্রমাঃ পমম ঋতুঃ ষষ্ঠে মরুতঃ সপ্তমে বৃহস্পতিরষ্টমে। মিত্রো নবমে বরুণো দশমে ইন্দ্র একাদশে বিশ্বে দেবা দ্বাদশে।। (যজুর্ব্বেদ ৩৯।৪।)

২। শ্রীমৎ নারায়ণ নারায়ণ স্বামীকৃত "মৃত্যু ও পরলোক"।

"ভস্মান্তং শরীরম্" (যজুর্বেদ ৪০ অধ্যায় ১৫ মন্ত্র) "শরীর ভস্মেই অন্ত হয়। যজুর্বেদের এই মন্ত্র প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, অন্ত্যেষ্টি কর্ম ব্যতীত পৃথক কোনও কর্ম মৃতকের জন্য দ্বিতীয়বার কর্তব্য নহে। হাঁ' সঙ্গতিপন্ন হইলে যদি তাহার আত্মীয় জীবিত কালে বা মরণের পরে বেদবিদ্যা, বেদোক্ত ধর্মের প্রচার, অনাথ পালন উদ্দেশ্যে যত উচ্ছা ধন-দান করিবেন ততই উত্তম। (মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত সংস্কারবিধি)। বেদের এই স্বচ্ছ, সরল ও সুবোদ সিদ্ধান্ত প্রচারের অভাবেই সমাজের নানারূপ দুর্নীতি, শঠতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব চলিয়াছে।

পিতুরুদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশে দেশে বহু বেশে এসেছিল
আসিবে আবার,—দেবতা আমার।

বহু কথা ছিল বলিবার, বলা তো
হলো না তাহা, এই দুঃখ রইল সবার।

চির বিদায়ের ক্ষণ, আজ পুণঃ
আসিয়াছে ফিরে, বরণ করিব না তারে
নয়নের তপ্ত অশ্রু নীরে।

চিত্তে ভরি কৃতজ্ঞতা, আশীর্বাদ তরে
তোমার উদ্দেশ্যে নমি নম্র নত শিরে।

'শ্রাদ্ধ ও পরলোক' ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিনু পিতঃ চরণে প্রণমি।

—বিনীত সন্তান
১৭ই বৈশাখ, ১৩৯৪